দিব্যপ্রসঙ্গ

স্বামী সুহিতানন্দ

পরমপূজনীয় সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

আমার সুযোগ হয়েছিল দশ বছর প্রেমেশানন্দজীর সেবা করার। সেই সময় তিনি একবার বলেছিলেন, "দেখো, স্বামীজীর সব ব্যাপারটাই হচ্ছে superlative degree. কোনও কিছুতেই ছোটখাট ব্যাপার নেই।" এটা স্বামীজীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য। ভাগবতেও আছে 'অসমোর্ধ্ব'—তাঁর সমানও কেউ নেই, তাঁর ঊর্ধ্বেও কেউ নেই। কোরাণেও আছে আল্লার কোনও শরিক নেই। আমার মনে পড়ছে, আমি তখন ছেলেমানুষ, যাতায়াত করছি, তখনও সঙ্ঘে যোগদান করিনি। স্বামীজীর নতুন যেসব বই বেরোচ্ছে সেগুলি পড়ে একদিন প্রেমেশ মহারাজকে বলেছি, "স্বামীজীর ছোট থেকে কী বৈরাগ্য!" মহারাজ শুনে হেসে বললেন, "তুমি আবার স্বামীজীর বৈরাগ্য কোথায় দেখলে?"

"কেন, বৈরাগ্য নয় তো কী?"

"বৈরাগ্য কাদের হয়? যাদের আসক্তি থাকে তাদের বৈরাগ্য হয়। স্বামীজীর কীসে আসক্তি ছিল যে বৈরাগ্য হবে? বৈরাগ্যই তো রূপ ধারণ করে এসেছেন।"

স্বামীজী এই ধরনের ব্যক্তিত্ব, unparalleled. প্রেমেশ মহারাজ আর-একটি কথা বলেছিলেন, আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল। "তোমরা সবাই বল, স্বামীজী আমেরিকা বিজয় করে এলেন। বিজয় মানে কী? একজনকে দাবিয়ে দিয়ে আর একজন একটা কিছু দখল করে—এর নাম বিজয়। স্বামীজী কি সেইজন্য গিয়েছিলেন? আমেরিকা দখল করতে গিয়েছিলেন? —না। নিউটন একটি নীতি আবিষ্কার করলেন, আইনস্টাইন একটি নীতি আবিষ্কার করলেন, সেটা গোটা পৃথিবী গ্রহণ করল। তাহলে পৃথিবী কি আইনস্টাইনের দ্বারা বিজিত হল? স্বামীজীর জয়ও সেইরকম। অর্থাৎ তিনি একটি চিরন্তন সত্য বলেছেন। সেই সত্য সকলের কাছে গ্রাহ্য হয়েছে, তাই সকলে সেটি গ্রহণ করেছে।''

একবার একটি স্কুল বা কলেজের কোনও অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে সকলেই খ্রিস্টান। সেখানে স্বামীজীর কোনও অনুষ্ঠান করা খুব কঠিন ছিল। তবু যাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা ভক্ত, স্বামীজীর ওপর অনুষ্ঠান করেছিলেন। একজন সিনিয়র ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এখানে আমরা সকলেই খ্রিস্টান। আমাদের জিসাস ক্রাইস্ট আছেন। এর মাঝখানে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে আসছেন কেন?" তাকে বললাম, "তোমরা জান না, স্বামী বিবেকানন্দকে আবিষ্কার কারা করেছে? খ্রিস্টানরাই তো করেছে। হিন্দুরা করেছে নাকি? গোটা ভারতবর্ষে তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেখানে তাঁকে কে আবিষ্কার করেছিল? আমেরিকায় খ্রিস্টানরাই তো তাঁকে প্রথম আবিষ্কার করল। তোমরাই তো করেছ। আবার তোমরাই এখন একথা বলছ?" তখন তারা শান্ত হল।

স্বামীজী আর ঠাকুরকে অনেকেই আমরা মনে করি দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিত্ব। স্বামীজী একেবারে জ্ঞানের খড়্গ ধরে, যেন নাস্তিকের ভাব নিয়ে চলেছেন। আর ঠাকুর হলেন ভক্ত, প্রতিমাপূজা করেন, তাঁর কাছে সবকিছুই মা। মা ছাড়া তিনি কিছুই জানেন না। আপাত বৈপরীত্য তো বটেই। ঠাকুর বলেছেন, ভগবানলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। যেমন করেই হোক ভগবানকে আগে লাভ করতেই হবে। আর স্বামীজী বললেন, "যে ভগবান বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারেন না, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে পারেন না, আমি সেই ভগবানে বিশ্বাস করি না।" একজন বললেন, সব ছেড়ে দিয়ে ভগবানের কাছে এসো। আর একজন বললেন, মানুষের সেবা করো। কিন্তু দেখা যাবে দুজনের মাইন্ড সেট একই। যেমন নিবেদিতাকে বলছেন, ধর্মকে আমাদের বিজ্ঞানের মতো করে দেখাতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন আমরা প্রত্যাখ্যানও করি না, মেনেও নিই না—যা সামনে এল তাকেই পর্যবেক্ষণ করি। পর্যবেক্ষণ করতে করতে তার ভেতরের সত্যটি প্রকাশ

পায়। ঠিক সেভাবে ভগবানকেও আমাদের দেখাতে হবে। স্বামীজী সকলের কাছে জানতে চাইতেন—আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন? আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?—ঠাকুরের প্রকৃতিও তাই। ব্রাহ্মণবাড়িতে জন্মেছেন, বাবাকে রঘুবীরের পুজো করতে দেখেছেন। কিন্তু প্রশ্ন জাগছে—এই পাথর রঘুবীরের মধ্যে সত্যিই কি ভগবান আছেন? যদি থাকেন তাহলে কীভাবে আছেন? কোথায় আছেন? মা কালী পাষাণী না চিন্ময়ী? ঠাকুর কিন্তু সাধারণ নাস্তিকের মতো নন। তিনি পজিটিভ নাস্তিক। তিনি বিজ্ঞানীর মতো নাস্তিক—যদি আমি এর মধ্যে সত্য পাই তাহলে বিশ্বাস করব, না হলে ছেড়ে দেব—এই ভাব। এভাবে চলতে চলতে তাঁর সামনে সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল। স্বামীজীর ক্ষেত্রেও তাই দেখছি। ছোটবেলা থেকে হুঁকো খাওয়া, চাঁপা গাছে দোল খাওয়া, ধ্যানে ডুবে যাওয়া, এরকম কত ছোট ছোট বাল্যলীলা! সব ঘটনার মধ্যেই আছে জানবার ইচ্ছা—এর মধ্যে কী আছে? এই মনোভাব স্বামীজীর বরাবরই ছিল।

আবার দুজনেরই মনোভাব আপোষহীন। স্বামীজী যেকোনও ঝুঁকি নিতে রাজি। বাচ্চা ছেলেকে ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে বাঁচাচ্ছেন ঝুঁকি নিয়ে। সারা জীবন ঝুঁকি নিয়েছেন। ঠাকুরও ঠিক তাই করলেন। উপনয়নের সময় প্রথম ভিক্ষা ধনি কামারনির থেকে নেবেন, কথা দিয়েছেন। কিন্তু যখন বাধা এল, বলে দিলেন এই উপনয়ন তিনি মানেন না। কারণ মিথ্যাচার হয়ে যাচ্ছে। তিনি লেখাপড়া করবেন না, চাকরি করবেন না, মাইনে নেবেন না—শুধু ভগবানকে ডাকবেন। এই ঝুঁকি নেওয়ার জেদ দুজনেরই এক।

আবার ভগবানকে উপলব্ধির যে-পদ্ধতি—সেটাও দুজনের প্রায় এক। ঠাকুর কীভাবে ভগবদ্দর্শন করলেন? মা কালী সত্যিই আছেন কী না—এই তীব্র ব্যাকুলতায় তাঁর দর্শন হয়ে গেল। তারপর তাঁর বিভিন্ন ধর্মে সাধনা আরম্ভ হল। অর্থাৎ আগে তিনি পৌঁছে গেলেন ছাদে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। অদ্বৈত, দ্বৈত, রামলালা—এইভাবে। স্বামীজীও তাই। ছোটবেলা থেকেই তিনি জ্যোতিদর্শন করে ঘুমোতেন। তাহলে তাঁর ঘুম সমাধি ছাড়া আর কী? জ্যোতিসমুদ্রে যে ডোবে সে কি ঘুমোয়? রায়পুরে রাস্তায় মৌচাক দেখে স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেল। যাঁর নির্বিকল্প সমাধি হয়ে গেল, তিনি সব জায়গায় জিজ্ঞাসা করে করে বেড়াচ্ছেন ভগবান আছেন কী না, ভগবান আছেন কী না—এটা কী ব্যাপার? তাঁর কি ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যিই কোনও সন্দেহ আছে? কোনও সন্দেহ নেই। কোন পদ্ধতিতে কীভাবে ভগবানকে পাওয়া যায়—এই পদ্ধতিটি তিনি জানতে চান। সেই পদ্ধতিটি জগতের সামনে দেখাতে চেয়েছেন। তার জন্যই ঠাকুরের কাছে গেছেন। ঠাকুর একটার পর একটা তাঁকে সাধন করিয়েছেন। সাধন করতে করতে তাঁর অনুভূতি হয়েছে। যখন ঠিক ঠিক অনুভূতি হল এবং তিনি সেই অনুভূতি শাস্ত্রের সঙ্গে মেলাতে পারলেন, তখনই তা গ্রহণ করলেন। ঠাকুরও ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কাছে সাধনা করলেন, পরে বেদান্ত সাধনাও করলেন, যখন শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে গেল, তখন মেনে নিলেন।

যেকোনও ক্ষেত্রেই সঞ্চয়ের পর সুষ্ঠু বণ্টনের প্রসঙ্গ আসে। হৃৎপিণ্ডে শরীরের সব রক্ত আসে, তারপর বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে আবার যদি সমস্ত দেহে ছড়িয়ে না পড়ে তাহলে মৃত্যু হয়। ঠিক সেইরকম, আধ্যাত্মিক সঞ্চয়ের পরেই বিতরণের

প্রশ্ন এসে যায়। আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়—নিজের মোক্ষ আয়ত্ত হল, কিন্তু মোক্ষ তো বিতরণ করার নয়; কাজেই আধ্যাত্মিকতাকে কীভাবে জগতে উপস্থাপন করবেন, সেইজন্য তাঁদের সাধনা করতে হয়েছিল। ঠাকুর আধ্যাত্মিকতা বিতরণের জন্য ডেকেছিলেন, "ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়!" স্বামীজীকে সমস্ত শক্তি, উত্তরাধিকার দিয়ে ঠাকুর বললেন, "তোকে সব দিয়ে ফকির হলুম।" আর স্বামীজী—যে-দায় ঠাকুর স্বামীজীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন তা নিয়ে কী করবেন, কেমন করে পালন করবেন—ভাবতে ভাবতে পাগলের মতো ঘুরলেন গোটা ভারতবর্ষ, বিদেশে গেলেন, সঙ্ঘ স্থাপন করলেন।

এই দুজনের সংযোগের স্থল শ্রীশ্রীমা। ঠাকুর বললেন মা-ই সত্য, আর স্বামীজী বললেন শিবজ্ঞানে জীবসেবাই সত্য। এই দুটো জিনিসকে কোথায় মেলানো যায়? স্বামীজী দক্ষিণেশ্বরে মাকে কীভাবে চিনেছিলেন জানি না। মা ডাল-রুটি রেঁধে দিচ্ছেন, আদরযত্ন করছেন, বাড়িতে মা-দিদিরা যেমন করেন সেইরকমই করছেন। এর বেশি বোঝার সুযোগ তখন হয়নি। শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে ঠাকুরের অসুস্থতার কারণে বাধ্য হয়েই সবাইকে একসঙ্গে মিলতে হয়েছে। যেখানে যত প্রকারের মানুষ ছিলেন সকলেই একত্রিত হলেন। ভাব ঘনীভূত হতে হতে সকলের একটাই উদ্দেশ্য হল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহের সেবা। এই সেবাই তখন সাধনা হয়ে গেল। সেই সাধনক্ষেত্রে মা একেবারে প্রধান হয়ে পড়লেন। মাকে ছাড়া ঠাকুরের এই সেবা সম্ভবই ছিল না। লাটু মহারাজ বলেছেন, তাঁরা যখন হতাশ, বিষণ্ণ হয়ে যেতেন ঠাকুরের অসুখ দেখে; ভাবতেন ঠাকুর মনে হয় আর থাকবেন না; মা তখন সকলকে বোঝাতেন, সান্ত্বনা দিতেন, হতাশ হতে বারণ করতেন। প্রথম যখন তাঁরা ভিক্ষায় গেলেন তখন মায়ের কাছেই প্রথম ভিক্ষা নিলেন। অর্থাৎ স্বামীজী সহ সকল ত্যাগী পার্ষদ মাকে মেনে নিলেন। স্বামীজী যখন ঠাকুরের আহ্বান পেলেন বিদেশ যাওয়ার তখনও তিনি বুঝতে পারলেন না—ঠিক, না মনের ভুল। মাকে চিঠি লিখলেন। মায়ের অনুমতি পেয়ে তবে গেলেন। পরে বিদেশ থেকে এসেছিলেন মিসেস সারা বুল, মিস ম্যাকলাউড, নিবেদিতা প্রমুখ। স্বামীজী জানতেন তাঁদের যদি মা মেনে না নেন তাহলে ভারতবর্ষের সমাজও মেনে নেবে না। কারণ তাঁরা ম্লেচ্ছ, সাদা চামড়ার লোক। মা যখন সহজেই তাঁদের মেনে নিলেন, আপন করে নিলেন, তখন স্বামীজী নিশ্চিন্ত হলেন, সন্দেহমুক্ত হলেন। ঠাকুর, মা, স্বামীজী—এই যে তিনটি হোমাগ্নি জ্বলল—এই তিনটি হোমাগ্নির উপরেই আজকের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত।

প্রেমেশানন্দজী আমাকে বলতেন, ঠাকুর হলেন শ্রুতিপ্রস্থান, মা স্মৃতিপ্রস্থান, আর স্বামীজী ন্যায়প্রস্থান। যেমন ঋষিরা সত্য আবিষ্কার করেছেন, শ্রুতিতে সেসব পাই, ঠাকুর তেমনি কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করলেন। মা সেই সত্যগুলিকে ল্যাবরেটরিতে হাতে-কলমে দেখানোর মতো কাজে প্রমাণ করে দেখালেন—ব্যাবহারিক জীবনে সত্য সত্যই ওগুলি করা যায়। মা তাঁর প্রতিটি কাজের জন্য প্রতি মুহূর্তে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব [শাস্ত্রমতে এই তিনটিই প্রমাণ] প্রমাণের মতো ঠাকুরের কথা তুলে ধরেছেন, ঠাকুরের উদাহরণ দিয়েছেন—তা আমরা 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পড়লেই বুঝতে পারি। আর স্বামীজী হলেন ন্যায়। বিজ্ঞান, সাইকোলজি, ফিলোসফি,

ভাষা—সর্বত্র স্বামীজী ওই সত্যটিই প্রয়োগ করে ব্যাখ্যা করেছেন। আজও সেই সত্যের অনুরণন চলছে। এই সত্যকে আদর্শ করেই বেলুড় মঠ, সারদা মঠ, ভাবপ্রচারকেন্দ্রগুলি চলছে। সারা পৃথিবীতে নানাভাবে নানাজনে এই ভাবান্দোলন তৈরি করেছে। একটা বিরাট আন্দোলন জগৎময় চলছে। এতে সাধুদের সঙ্গে গৃহস্থরাও সক্রিয় অংশ নিয়েছেন। বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ বলেছেন, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সন্ন্যাসী ও গৃহীর সম্মিলিত সঙ্ঘ।

দীক্ষা দেওয়ার সুবাদে আমাদের ভক্তদের আর-একটি জগৎ আমি দেখতে পেয়েছি। যেহেতু আমার কাছ থেকে তারা মন্ত্র পায়, তাই তারা তাদের মনের কথা আমাকে বলে। আমি দেখেছি ঘরে ঘরে সব ঋষিকল্প মানুষ। বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবার মধ্যে কত সাধক-সাধিকা রয়েছেন। স্বামীজী বলেছেন, এরপরে ঋষিরা জন্মগ্রহণ করবেন। এখনই সব ঋষিরা আসছেন। আপনাদের মধ্যেই তাঁরা আছেন।

একটি ঘটনা বলি। এক ইরানিয়ান মহিলা শিক্ষিকা। তাঁর একটি মেয়ে খুব দুষ্টু। তিনি বলছেন, "এই মেয়েকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। কিন্তু ছেড়েও দিতে পারছি না, কারণ আমারই তো মেয়ে। ওকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরছি।" তাঁকে 'কথামৃত' পড়তে দিয়েছিলাম, তারপরে 'মায়ের কথা' পড়ে তিনি মায়ের জীবনী জানতে পারলেন। জেনে তিনি বলছেন, "মায়ের কথা পড়ে আমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমি মেয়ের নাম রেখেছি রাধি। মা যদি তাঁর রাধিকে সামলাতে পারেন, আমিও আমার রাধিকে সামলাতে পারব।" ইনি আমার কাছে আমেরিকার ফিজিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। আর একজনের কথা বলি। ব্রাজিলের সাফালোতে আমাদের একটি কেন্দ্র আছে। আমি তখন জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম। সেখানে গেছি। সেখানে একটি প্রাইভেট আশ্রম সবে নেওয়া হয়েছে। আমাদের একজন সন্ন্যাসী সেখানকার প্রেসিডেন্ট আর বাইরের এক ভদ্রলোক ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি এসে আশ্রমের সুবিধা-অসুবিধার কথা বলছেন। কাজের কথা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে একটু ঘরোয়া কথা বলতে শুরু করলাম। কটি ছেলেমেয়ে, তারা কী করে ইত্যাদি। তিনি বললেন, "তিনটি ছেলে। বড় ছেলে ডাক্তার—কার্ডিয়াক সার্জেন, আমেরিকায় থাকে, প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়জন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, সেও এখানে আছে। আঠারো বছরে তার দীক্ষা হয়েছে আর্জেন্টিনায়। ভাল ছেলে। তৃতীয়জন এখনও ভাল করে তৈরি হয়নি, তাকে নিয়েই আমার চিন্তা। এই আশ্রমই আমার তৃতীয় সন্তান।" তাঁর কী একাত্মতা! "Ashrama is my third son!" এইরকম সব ভক্তরা দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে আছেন।

রাশিয়া থেকে একটি মেয়ে বেলুড় মঠে এসেছিল। খুব বেশি বয়স নয়, বছর পঁয়ত্রিশ হবে। রাশিয়ায় আমাদের আশ্রমে খুব কাজ করে। ওখানকার সেক্রেটারি রথীন মহারাজ তাকে পাঠিয়েছিলেন। তাকে মায়ের একটি প্রসাদি কাপড় দিলাম। বললাম, "তুমি তো শাড়ি পরতে পারবে না, গাউন করে পোরো।" সে তো মাথায় ঠেকিয়ে খুব শ্রদ্ধা করে নিল। পরদিন আর-এক জার্মান মেয়ে এল। খুব উচ্চপদস্থ। তাকেও প্রসাদি কাপড় দিয়ে বললাম, "গাউন করে পরবে।" কয়েকদিন পরে মায়ের তিথিপুজোয় সকলে প্রণাম করছে। হঠাৎ দেখছি তিনটি মেয়ে প্রণাম করছে। একজন আমাকে বলল, "দেখুন শাড়ি পরেছি।" দেখি সেই জার্মান, রাশিয়ান আর

একজন ভারতীয়, আমেরিকায় থাকে, সে তাদের কাপড় পরিয়ে নিজেও পরে তাদের এনেছে। বলেছে, "চলো মহারাজকে একটা সারপ্রাইজ দিই।" মায়ের কী লীলা! কোথায় জার্মানি, কোথায় রাশিয়া, কোথায় আমেরিকা! তিনজনকে টেনে এনেছেন। কোথায়? না বেলুড় মঠে! তাদের বললাম, "তোমরা মায়ের তিন মেয়ে। সোজা চলে যাও মায়ের মন্দিরে, তিন বোনে গিয়ে মাকে প্রণাম করো।"

ঠাকুর-মা-স্বামীজী এইভাবে জগতের ওপর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে অদ্ভুত উপায়ে প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন। এমন অনেকে দীক্ষা নিয়েছে যারা উচ্চকোটির সাধক-সাধিকা। স্বামীজী যে বলেছেন, মা বলেছেন সকলে আসবে, সত্যিই তারা এসেছে। ঘরে ঘরে দেখছি কত উচ্চমনের সব বাবা-মা। বাবা-মা কেমন পরিবেশ তৈরি করলে এমন ছেলেমেয়ে হয়! কিছুদিন আগে একবার ডিব্রুগড় গেছি। সকলে লাইন দিয়ে প্রণাম করছে। একটি ছোট মেয়ে, পরে জেনেছি তার ছয় বছর বয়স, লাইন থেকে ছুটে এসে আমার চেয়ারের হাতলে হাত দিয়ে পাশে দাঁড়াল। কানে কানে বলল 'দীক্ষা দীক্ষা'। শুনে হেসে তার হাতে লজেন্স দিলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে বলল, "না, না, মন্ত্র।" আমি তার মায়ের দিকে তাকালাম। মা বললেন, "আমি কিন্তু কিছু বলিনি। তবে ও অনেক সংস্কৃত স্তোত্র জানে। আমি স্তবপাঠ করি, আমার কাছে বসে ও-ও করে।" তার কাছে শুনতে চাইলাম। ও ধীরে ধীরে একটা স্তব বলল। ওর কষ্ট হচ্ছে দেখে বললাম, "ঠিক আছে। তোর দীক্ষা হবে।" দীক্ষা হল। তা অত ছোট মেয়ে, ভয় পাচ্ছিলাম, মা তো দীক্ষার সময় থাকবে না! ও অতক্ষণ বসে থাকতে পারবে তো? দীক্ষার দিন ওর মা ওকে শাড়ি পরিয়ে পুতুলের মতো সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। দেখলাম কতক্ষণ সোজা হয়ে সুন্দর বসে রইল। মন্ত্র এবং যা যা করণীয় সব সুন্দরভাবে হুবহু গ্রহণ করল। কী করে পারল? সংস্কার এবং মা-বাবার শিক্ষা।

নিউজিল্যান্ডে একটি নয় বছরের মেয়ে দীক্ষা নিয়েছে। দুবছর পর আবার গেছি। তখন সে আমাকে আলাদা করে একটা প্রশ্ন করতে চাইল। জিজ্ঞাসা করল, "মহারাজ, কীভাবে বুঝব যে আমি ঠিক ঠিক সাধন-ভজন করছি?" ভাবুন এই প্রশ্ন করছে একটি এগারো বছরের মেয়ে! তার বাড়ির পরিবেশ নিশ্চয়ই সেরকম। সকলে সাধন-ভজন-গান করেন। এইরকম ঘরে ঘরে। আবার শিলচরে, আমি ভোর পৌনে পাঁচটায় হাঁটছি। আশ্রমের সামনের বাড়িতে একজন বুড়িমা উঠে বাড়ির সকলকে, এমনকী কচিকাঁচা সব্বাইকে নিয়ে একসঙ্গে ভগবানের নাম করছে। এভাবে খানিকক্ষণ চলার পর বন্ধ হল। এইভাবে ঘরে ঘরে সুন্দর আশ্রমিক পরিবেশ সৃষ্টি করছেন অনেকেই। শিলচর বা কোথাও একটি আট-নয় বছরের ছেলে প্রণামের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রণামের সময় সবাইকে দুটো করে লজেন্স দিচ্ছি। বাচ্চা ছেলে দেখে ওকে চারটে দিলাম। ছেলেটি একটা নিয়ে বাকি তিনটে আমাকে ফেরত দিল। আমি আবারও তিনটি লজেন্স ওকে দিলাম। তখন একটু হতভম্ব হয়ে খানিকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ওই লজেন্স তিনটে নিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কাছে একটা একটা করে রেখে ছুটে গিয়ে বাবার কাছে দাঁড়াল। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, এইরকম ঋষিকল্প সন্তান যেন সমাজে তৈরি হয়। নি